প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৪৯

প্রকাশক : সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ
কলকাতা-১৭

মুদ্রক : হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

ঋতু ও বুদ্ধদেবের জন্য

গ্রন্থকারের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

নীল নির্জন
অন্ধকার বারান্দা
প্রথম নায়ক
নীরক্ত করবী
নক্ষত্র জয়ের জন্য
কলকাতার যীশু
শ্রেষ্ঠ কবিতা
উলঙ্গ রাজা
খোলা মুঠি
কবিতার বদলে কবিতা
আজ সকালে
পাগলা ঘণ্টি
কবিতা সমগ্র ১
ঘর-দুয়ার

ছোটদের জন্য

সাদা বাঘ
গঙ্গা-যমুনা

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

কবিতার ক্লাস
কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা
কবিতার কী ও কেন

উপন্যাস

পিতৃপুরুষ

সূচীপত্র

সময় বড় কম

রহস্য-উপন্যাস

সকালবেলার আকাশটা যখন
বিজ্ঞাপনের মেয়েটির দাঁতের মতো
ঝকঝক করছিল,
তখন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে,
বিকেলবেলায় ঝড় উঠবে।

বিকেলবেলায় যখন
মেঘের চোখে রাগের ঝিলিক দেখে
ভয়ে গুড়গুড় করে উঠেছিল
আকাশের বুক,
তখনও কেউ জানত না যে,
রাত্রি আবার সেই আকাশের মুখে
হাজার তারার হাসি ফোটাবে।

আকাশ এখন হাসছে।
কাল সকালেও হাসবে কি না, ভাগ্যিস তা কারও
জানা নেই।
জেনে গেলে নিশ্চয় বিস্ময়ে-ঠাসা এই রহস্য-উপন্যাসের
তিনটে পাতাও পড়া যেত না।

যদি বলো

পথের মধ্যে কেউ কাঁটা আর কাচের গুঁড়ো
ছড়িয়ে রেখেছিল।
এই ছাখো,
আমাদের দু'জনেরই পা তাই রক্তাক্ত।

বাতাসে ছিল আগুনের হলকা।
এই ছাখো,
আমাদের গায়ের চামড়া তাই পুড়ে গেছে।

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।"
কিন্তু বিশ্বাস করো,
সন্তানদের জন্যে চাইছি বটে, কিন্তু
নিজেদের জন্যে অত আরাম আমরা চাই না।

বরং যদি জীবনটাকে আবার নতুন করে
শুরু করতে বলো, তো
ওই কাঁটা, ওই কাচের গুঁড়ো, আর ওই
আগুনের হলকার ভিতর দিয়েই
আবার আমরা এই এতটা পথ খুব খুশিমনেই
হেঁটে আসব।

ফোন থেমে যাবার পর

ফোনটা বেজে উঠবার পরে আমি আর
একটুও দেরি করিনি।
অতিথিকে বিদায় দিয়ে,
সদর-দরজায় খিল লাগিয়ে, চটপট
দোতলায় উঠে এসেছিলুম।
কিন্তু ফোন ইতিমধ্যে থেমে গেছে।

অগত্যা আমাকে একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে
ফোনের পাশেই চুপচাপ কিছুক্ষণ
দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তিন সপ্তাহ আগেকার সেই
সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা উল্টে যাই;
কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে টেলিফোনের দিকে।
আমার মনে হয়, যন্ত্রটা আবার
এক্ষুনি বেজে উঠবে!

কিন্তু বাজে না।

তখন একটা অস্বস্তি দেখা দেয় আমার মনে।
যিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছিলেন,
আমি ভাবতে থাকি যে, তাঁর কী হল?
সত্যি বলতে কী, ফোনের এই বেজে উঠে থেমে যাবার ব্যাপারটাকে যেন
তাঁরই স্তব্ধতা বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন?
হঠাৎ কি তাঁর মনে হয়েছে যে, আমাকে এইভাবে ফোন করবার
কোনো দরকারই তাঁর নেই?
নাকি রিসিভারটাকে হাতের মধ্যে ধরে বসে থাকতে-থাকতেই হঠাৎ

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি ?
নাকি পিছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অকস্মাৎ কেউ
টিপে ধরেছে তাঁর গলা ?

সারাটা দিন এইসব প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে
ছুঁচ ফোটাতে থাকে।
কোনো কাজেই মন বসাতে পারি না আমি।
কিন্তু কাউকে সে-কথা জানাতেও পারি না।
কেননা, যাকে জানাব,
সে-ই একগাল হেসে বলবে যে, নীরেনবাবু,
এ আর কিছুই নয়,
রাত জেগে গোয়েন্দা-উপন্যাস পড়বার ফল।

কবির মূর্তির পাদদেশে

কবিকে তারাই বানিয়ে তুলেছিল, এই
ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে
তারা এখন
ছেনি ও হাতুড়ি নিয়ে
কবির মূর্তির পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাদ্রমাস ফুরিয়ে আসছে।
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরে টলটলে নীল আকাশকে এখন
সমুদ্র বলে ভ্রম হয়।
কিন্তু ঠিক এই সময়েই নীচের মাটিতে জমেছে তাদের
ভ্রান্তির খেলা।

কবি যে তাদের হুকুম মানতে রাজি হননি,
তাঁর এই অমার্জনীয় অপরাধের
শাস্তি হিসেবে
তারা বলছে, "আমরাই তাঁকে বানিয়েছিলুম, এখন
আমরাই তাঁকে ভাঙব।"

কিন্তু, তারা যদি না-ই বানাবে, তবে
কে বানিয়েছিল এই কবিকে ?
বানিয়েছিল তাঁরই সময়।
তাঁরই প্রস্তুতিপর্বের নিরন্তর ব্যর্থতা ও গ্লানি,
অপমান ও যন্ত্রণা।

আজ যারা তাঁর মূর্তি ভাঙবার জন্যে
হাতুড়ি তুলেছে,
প্রাতিষ্ঠানিক সেইসব বর্বরের
অন্তহীন প্রতিরোধ ও ধিক্কারও অন্তত খানিক পরিমাণে তাঁকে
তৈরি করে তুলেছিল।

মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে তারা আজ আস্ফালন করছে।
কিন্তু তাদের জানা নেই যে,
তাদেরই অনিচ্ছার আগুনে ঢালাই হয়ে
তৈরি হয়েছে ওই মূর্তি।
কোনো হাতুড়িই ওই মূর্তিকে আর এখন ভাঙতে পারবে না

ভরদুপুরে

এইবারে কী হবে, সেটা অল্পস্বল্প বুঝে নিতে পারি।
শরতে হেমন্তে আর শীতে
পূজায়-পার্বণে দেখব সমস্ত ঘরবাড়ি
মুখ ফিরিয়ে আছে, বন্ধুবান্ধবেরা আকারে-ইঙ্গিতে
জানাবে, খানিকটা দূরে যাওয়া
ভাল···মানে উভয়পক্ষেরই তাতে ভাল। ঘুরে-ঘুরে
দুপুরের হাওয়া
বলবে, "একটু দূরে থাকো, দূরে থাকো, দূরে।"

অশথের শাখা
নদীকে ছোঁবার জন্যে মাঝে-মাঝে একটু ঝুঁকে থাকে।
ভরদুপুরে বিশ্ব করে খাঁখাঁ।
অজয়ের শুকনো বালি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছনের ডাকে
হাওয়া ফিরে যায়।
ভাদ্রও এমন কাণ্ড ঘটাবে তা কক্ষনো ভাবিনি।
বুকের ভিতরে বসে খড়কুটো যে রাতদিন পোড়ায়,
তাকে চিনি, বিলক্ষণ চিনি।

দূরত্ব

নতুন করে যখন আর কেউ
কাছে আসে না,
এবং কাছের মানুষরা যখন ক্রমেই আরও
দূরে চলে যায়,
তখনই বুঝে নিতে হয় যে,
বুড়ো-বয়সের দিনগুলি এবারে
শুরু হয়েছে।

সবাই কিছু-না-কিছু উত্তাপ চায়। অথচ
বার্ধক্যের কোনো উত্তাপ নেই।
বুড়োরাও তাই বুড়োদের বিশেষ পছন্দ করে না
আগুনের খোঁজে
পরস্পরকে ছেড়ে তারাও
ক্রমেই আরও
দূরে চলে যেতে থাকে।

পার্কের বেঞ্চির দুই মাথায় বসে আছে
দুটি বৃদ্ধ।
মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান।
দেখলেই বোঝা যায় যে,
দুজনেই দুজনের বয়সের শীতকে ভীষণ ভয় পায়।
কিছুতেই ওরা
পরস্পরের কাছে গিয়ে বসবে না।

লালদিঘিতে বৃষ্টি

স্নানের পাট চুকিয়ে
মেঘের শাড়িখানাকে খুলে রেখে
আশ্বিনের খটখটে রোদ্দুরে নিজেকে শুকিয়ে নিচ্ছিল
আকাশ।
হঠাৎ চোখে পড়ল যে,
লালদিঘির মধ্যে তার ছবি ফুটেছে, আর
হাঁ করে সেই
বেআব্রু ছবির দিকে তাকিয়ে আছে
বেহায়া একদল মানুষ।

কী ঘেন্না! কী ঘেন্না!
রাগে, অপমানে নিমেষে আবার কালো হয়ে গেল
আকাশের মুখ।
চড়বড় করে বৃষ্টি নামল তক্ষুনি। আর
মাথা বাঁচাবার জন্যে
পালাতে পালাতেই লোকগুলো দেখতে পেল যে,
বৃষ্টির ছর্‌রায়
জলের স্থির আয়নাখানা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্নের শবদেহ

ওর চিবুকের নীচের ওই কাটা-দাগটা বুঝি দেখতে পাওনি ?
দেখলে বুঝতে পারতে,
ছেলেবেলায় লোকটা বিশেষ শান্তশিষ্ট ছিল না।

ওর চোয়ালের গড়নও তোমাদের চোখে পড়েনি।
তা যদি পড়ত, তাহলে এটাও তোমাদের অজানা থাকত না যে,
বিনাবাক্যে পিছু হটবার মতো মানুষ ও নয়।

ওর ওই দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও তোমরা দেখে নাও।
ওই ভঙ্গিটাই জানিয়ে দিচ্ছে যে,
লোকটা আসলে যেমন গোঁয়ার, তেমনি জেদি।

কিন্তু ওর চোখের সঙ্গে ওই কাটা-দাগ, ওই গড়ন, আর ওই
ভঙ্গিটাকে আজ আর
আমিও ঠিকমতো মিলিয়ে নিতে পারছি না।

ওর ওই ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম
মনে হয়েছিল, এককালে ও স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সেই
স্বপ্নটা কবেই মরে গেছে।

চোখের মধ্যে মৃত স্বপ্নের শবদেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা।
যেমন করেই হোক ওকে প্রসন্ন করো। নইলে, আমি জানি,
ও-ই তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে।

স্মৃতিকথা

ইংরেজ আমলের
রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
রায়সাহেব শ্রীদুর্গাগতি খাসনবিশের আত্মজীবনী এখনও
প্রকাশিত হয়নি বটে,
কিন্তু তার পাণ্ডুলিপির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে আমি
অবাক হয়ে যাই।

ভদ্রলোক সেখানে খুব স্পষ্ট করেই
জানিয়ে দিয়েছেন যে,
ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে তাঁর একটা
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ঠিকই, কিন্তু
কোনো জলপ্লাবন কিংবা ভূমিকম্পের পিছনে তাঁর
কিছুমাত্র হাত ছিল না।

আমি অবাক হই। এবং পরক্ষণেই আমার খুব
গৌরববোধ হয়।
কেননা, শ্রীখাসনবিশের এই অকপট উক্তিই আমাকে
বুঝিয়ে দেয় যে,
সত্যকারের একজন নিরহঙ্কার মানুষকে আমি আমার
প্রতিবেশী হিসেবে পেয়েছি।

ভালবাসা এইরকম

ভালবাসা ছিল, জ্বালা-যন্ত্রণাও কিছু কি ছিল না?
ছিল, যে-রকম
সাদা কালো আলো অন্ধকার
সর্বদা এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে মিলেমিশে থাকে।
থাকা যে তেমন থাকা, মিলেমিশে থাকা,
গনগনে রোদ্দুরে
পুড়তে পুড়তে ঘরে ফিরে রাত্তিরে আবার
একটিই বালিশে মাথা রাখা,
ঝগড়া ও তর্কের ফাঁকে-ফাঁকে
কাছে এসে, কপালে চুম্বন রেখে, পরক্ষণে চলে যাওয়া দূরে,
তাও জানা ছিল।

ভালবাসা ছিল। গোটা ভাবনায় সে বাসা বেঁধে ছিল।
তাই সবই তাৎপর্য পেয়েছে।
যুদ্ধ, সন্ধি, শোণিত, চুম্বন, স্বপ্ন, ক্ষুধা ও পিপাসা,
সমস্ত-কিছুর মধ্যে ঘরবাড়ি বানিয়ে রেখে গেছে
যন্ত্রণাজড়িত ভালবাসা।

পরবাস

চতুর্দিকে তার
দুঃখ ও যন্ত্রণা ছিল। নিন্দামন্দ ছিল। ব্রণলোভী
অজস্র মাছিও ছিল। ঘরে
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার
বুকফাটা চিৎকার ছিল, বাইরে কোনো শুশ্রূষা ছিল না।

থাকা ও না-থাকা মোটামুটি
চিরকালই এইরকম। ছবি
দ্বিপ্রহরে নিত্যদিন ফুটেছে তবুও।

আজও ফোটে। চতুর্দিকে বিরুদ্ধতা এখনও, তবুও
তারই মধ্যে কবি
মশা মাছি আরশুলা ও উইপোকা তাড়িয়ে
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কান্না ছেনে, গনগনে আগুন ছেনে শুদ্ধ প্রতিমার
স্বপ্ন দেখে। দুই হাত বাড়িয়ে
বারবার
বৃষ্টিধোয়া আকাশের শুশ্রূষাকে কেড়ে আনতে চায়।

কেড়ে যে আনে না, তাও নয়।
অথচ কাদের জন্য আনে, তা সে নিজেও জানে না।
তাহলে কেন সে আসে, পরবাসে সুদীর্ঘ সময়
সে কেন কাটিয়ে চলে যায়?

স্বপ্ন যখন ভেঙে যায়

সিমেণ্ট কিংবা চুন-সুরকির ব্যাপার তো নয়,
স্রেফ স্বপ্ন দিয়ে
গেঁথে তোলা হয়েছিল ওই
চক-মিলানো বাড়ি।
কিন্তু স্বপ্নগুলি এখন একের-পর-এক ভেঙে যাচ্ছে।
বাড়িটা দেখে তাই আজকাল
ভয় হয়।

ওই বাড়ির মধ্যে এখন যারা সংসার পেতেছে,
তারা কেউই অবশ্য কোনো
স্বপ্ন-টপ্নর ধার ধারে না।

তাদের ছেলেরা এখন
ছাতের উপর পায়রা ওড়াচ্ছে, আর
পাশের বাড়িতে তাদের মেয়েরা পাঠাচ্ছে
ঢিলের সঙ্গে চিঠি।
হাজার ঘরের হাজারটা বউ
নিয়ম-মাফিক
গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, পটের বিবিটি হয়ে
বসে আছে। তাদের
গলদঘর্ম ফুলবাবুদের এখন ঘরে ফিরবার সময়।

কিন্তু ওরা কেউই কোনো স্বপ্ন-টপ্নর ধার ধারে না।
বাড়িটা দেখে তাই বড্ড
ভয় হয়।

জীবন্ত সুন্দর

সৌন্দর্যের ঠোঁটের উপরে
ঠোঁট রেখেছে
সাহস।
সৌন্দর্যকে তাই
আজ এই ভয়ঙ্কর রাত্রে যেন
আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে
নিজেরই দুই চোখে দুই অগ্নিশিখা জেলে
মৃত্যুর মুখের উপরে তর্জনী তুলে
জীবন বলছে, "তুমি ফিরে যাও।"
জীবনকে আর কখনও এত
জীবন্ত দেখায়নি।

আমি যে আজও বেঁচে আছি,
শুধু এরই জন্যে ডেকে-ডেকে সবাইকে আজ
কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছে হয়।
বেঁচে না-থাকলে
এত সুন্দর ও এত জীবন্ত এই চিত্রটি আমার
দেখাই হত না।

সময় বড় কম

কলিং বেল বেজে উঠতেই
দরজার আই হোল্‌-এ উঁকি মেরে যাকে দেখতে পেলুম,
তার চোখের কোনো চামড়া নেই, আর
গায়ের চামড়া ছাইবর্ণ।
চিনতে একটুও অসুবিধে হল না ; কেননা
এর আগে আরও
সাত-আটবার এই লোকটিকে আমি দেখেছি।

শেষ দেখি ছিয়াত্তর সালে, যমুনোত্রীর পথে।
আল্‌গা একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে আমার ঘোড়াটা যখন
খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে,
সামনের পাহাড়ের চূড়ায় তখন ওকেই আমি
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম।
পথের উপরে ঝুঁকে পড়া একটা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে
সেবারে আমি বেঁচে যাই।

মুখটা আমি চিনে রেখেছি। তাই ওকে
দেখবামাত্র আমার বুকের রক্ত ছল্‌কে ওঠে। আমি বুঝতে পারি,
মৃত্যু আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আজও কি ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব ?
কথাটা ভাবতে-ভাবতেই আমি
ঘুরে দাঁড়াই, এবং জীবনের হাত-দুখানা আঁকড়ে ধরে বলি,
"সময় বড় কম,
এসো, আর দেরি না-করে আমাদের ঝগড়াটাকে এবারে
মিটিয়ে নেওয়া যাক।"

জীবন বলতে যে ঝগড়ুটে প্রেমিকার কথা আমি বোঝাচ্ছি,
স্পর্শ করবামাত্র তার মুখের উপরে এক
টকটকে রক্তাভা ছড়িয়ে যায়। আর
চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে ভোরবেলাকার রহস্যময় আলো।
মুখ নামিয়ে সে বলে,
"কিন্তু কলিং বেল যে বেজেই যাচ্ছে।"

তৎক্ষণাৎ তার কথার কোনো জবাব আমি দিই না।
জীবনকে আমি আমার বুকের মধ্যে টেনে নিই।
তারপর তার শরীরের
উষ্ণ আর্দ্রতার মধ্যে ডুবে যেতে-যেতে বলি,
"বাজুক।
আমার কোনো তাড়া নেই।"

বয়সের দোষ

যেমন হরেক রকমের খাদ্যবস্তু,
তেমনি ভালবাসারও স্বাদগন্ধ ইদানীং
পালটে গেছে।
ঘ্রাণ নিয়ে কি কামড় লাগিয়ে আজকাল আর
মনেই হয় না যে,
এটা সেই লক্ষ্মীবাবুর আসল সোনা।

মনে যে হয় না,
তার একটা কারণ নাকি বয়স।

আমাদের পাড়ার বিষ্টুবাবু সেদিন বলছিলেন যে,
সেটাই হচ্ছে আসল কারণ।
"কিছুই আসলে পালটায়নি মশাই।
না কোনো স্বাদ, না কোনো গন্ধ।
কিন্তু মুশকিলটা কী হয়েছে জানেন,
আমাদের বয়েসটাই ইতিমধ্যে পালটে গেছে।"

দরজা ভাঙার আগে

পিছু হটতে-হটতে
লোকটা এখন সেইখানে এসে পৌঁছেছে:
যেখান থেকে
শুরু হয়েছিল তার যাত্রা।

চারদিকে দেওয়াল।
মাথার উপরে ছাত।
ছাতের এক-বিঘত নীচে একটা ঘুলঘুলি।
ঘরের এক কোণে একটা টুল।

বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে সে যখন
সেই টুলের উপরে দাঁড়ায়,
ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে
এক-চিলতে আকাশ তখন তার চোখে পড়ে।

দরজার বাইরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে।
ঝুলুক।
আকাশটা যার দৃষ্টি থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি,
সে জানে যে, এমন কোনো দরজা কোথাও নেই,
যা ভাঙা যায় না।

ঘাটশিলা থেকে গয়েরকাটা

ঘাটশিলার কাছে
এন. এইচ. সিক্সের কুচকুচে কালো পিঠের উপর থেকে তার
দিনভর-রোদ্দুর-খেয়ে-গরম-হয়ে-ওঠা
শস্যের
শেষ কয়েকটি দানাকে খুব যত্নভরে
খুঁটে তুলতে-তুলতে
সাড়ে-পাঁচ কাঠা জমির মালিক এক চাষি আমাকে বলেছিল,
হাইওয়ে হয়ে ইস্তক
এই তাদের একটা মস্ত উপকার হয়েছে যে,
রাস্তার উপরেই
দিব্যি এখন ধান শুকোনো যায়।

সূর্যদেব তখন
সারা আকাশে তাঁর খুনখারাবি রঙের বালতি উপুড় করে দিয়ে
দিগন্তরেখার ঠিক নীচেই তাঁর
রক্তবর্ণ মুখখানাকে
আধাআধি লুকিয়ে ফেলেছেন।
সরকার বাহাদুরের কোনো প্রতিনিধি তখন
অকুস্থলে হাজির ছিলেন না।
থাকলে নিশ্চয় সরকারি সড়কের এই
অচিন্ত্যপূর্ব উপকারিতার কথা শুনে
তাঁর মুখও সেদিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠত।

কিন্তু এন. এইচ. থার্টিফোরের উপর দিয়ে যখন আমরা
গয়েরকাটার দিকে এগোচ্ছিলাম,
তখন ধান শুকোবার সময় নয়।
পাশের গাঁয়ের এক চাষি তখন তাই খুব মনোযোগ সহকারে

শাবল দিয়ে খুঁড়ে তুলছিল
হাইওয়ের পিচ।
পিচ দিয়ে কী হবে, জিজ্ঞেস করতেই একগাল হেসে
সে আমাকে জানায় যে,
হাইওয়ে হয়ে ইস্তক আর রাংঝালের দরকার হয় না;
গোটা গাঁয়ের ফুটো-বালতি এখন
পিচ গলিয়েই দিব্যি মেরামত হয়ে যাচ্ছে।

সরকার বাহাদুরের কোনো প্রতিনিধি সেদিনও
অকুস্থলে হাজির ছিলেন না।
একমাত্র সূর্যদেবই আমাদের কথোপকথনের সাক্ষী।
কিন্তু সূর্যদেব সেদিনও খুব লজ্জা পেয়েছিলেন নিশ্চয়;
গয়েরকাটার আকাশে তিনি আর তাই
খুনখারাবির খেলা দেখাননি।
গাঁয়ের চাষির সঙ্গে যখন আমার কথাবার্তা চলছে,
ফাঁক বুঝে তখন
টুক করে একসময় তিনি
আংরাভাসা নদীর জলে তলিয়ে যান।

ভুল ভাঙছে

আচমকা কতকগুলো ইট-পাটকেল এসে আমার
রক্ত ঝরাচ্ছে ঠিকই,
কিন্তু এর সবটাই যে ঘোর লোকসানের ব্যাপার,
তাও হয়তো নয়।
আর-কিছু না হোক,
এতদিন যাঁদের যৎপরোনাস্তি মানুষ বলে জানতুম,
তাঁদের আসল পরিচয়টা যে এই
দুর্যোগের মধ্যেই আজ
যৎপরোনাস্তি জানা হয়ে গেল,
কে জানে, সেটাই হয়তো মস্ত লাভ।

জানা যেত না,
যদি না তাঁদের মুখোশগুলোকে তাঁরা
নিজের হাতেই খুলে ফেলতেন।

ইট-পাটকেল হাতে নিয়ে তাঁরা
দাঁড়িয়ে আছেন।
হোহো করে তাঁরা হাসছেন।
অন্যের কপাল থেকে রক্ত ঝরছে, এই দৃশ্য দেখার আনন্দে
ধুলোর মধ্যে
ডিগবাজিও খাচ্ছেন কেউ কেউ।
আর আমি দেখছি তাঁদের মুখোশবিহীন
মুখগুলিকে।
ভুল করে যাঁদের মানুষ ভেবেছিলুম,
তাঁরা যে আমার ভুল ভেঙে দিয়েছেন,
সেটাই আমার মস্ত লাভ।

বৃত্তের ভিতরে

যাকে বলি সম্ভবপরতা, তার বৃত্তের ভিতরে
সবই ছিল।
এই জয়, এই পরাজয়, এই
ভালবাসা এবং বিরহ,
সাফল্যের পরবর্তী প্রচণ্ড শূন্যতা।
চৈত্রের যে-ঝড়ে
ছিঁড়েখুঁড়ে উড়ে যায় আকাশের নীলবর্ণ চিঠি,
সেই ঝড়, এবং আকাশী সেই নীলও।
ছিল কথা।
এবং নৈঃশব্দ্য, তাও ছিল।
এমন কিছুই নেই, যা সেই বৃত্তের মধ্যে নিহিত ছিল না

পৃথিবী কুড়িয়ে নিচ্ছে আকাশের সোনা
এখন দুপুরে দুই হাতে।
অথচ সমস্ত সোনা নিত্যই আকাশে ফিরে যায়
গোধূলিবেলায়।
এই পাওয়া, এই নিত্য পেয়ে তাকে নিত্যই হারানো ;
তুমি জানো,
বৃত্তের ভিতরে এও ছিল।
আমরা সোনার গল্প শুনে যাই অন্ধকার রাতে।

সন্ধ্যালগ্নে, সমুদ্রবেলায়

একাকী মানুষ গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই সমুদ্রবেলায়।
ওর কোনো ঘর নেই,
ওর কোনো গৃহস্থালি নেই।
হাড়হাভাতেরও চিত্তে
ঘর বানাবার কিংবা গৃহস্থালি সাজিয়ে বসবার
ইচ্ছা তো অনেক ক্ষেত্রে থেকে যায়।
কিন্তু না, তেমন কোনো ইচ্ছা ওকে পীড়ন করে না।
পর্বতের চূড়া থেকে
নেমে এসে জলের উপরে চোখ রেখে
ও আজ একাকী এই সন্ধ্যালগ্নে সমুদ্রবেলায়
দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গত বৎসরেও খুব ঝঞ্ঝাবাদলের দিন গেছে।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির খেলায়
পাহাড়ে নেমেছে ধস, নদী
বিস্তর বসতবাড়ি শস্যখেত ভাসিয়ে নিয়েছে।
এ-বৎসর সেরকম অতিবৃষ্টি কোথাও ছিল না!
বরং জলের
অনটনে খাল বিল নদী ও পুকুর
দিনে-দিনে শুকিয়ে উঠেছে। মাঠে
ধান, গম কিংবা রবিশস্যের বদলে বসুন্ধরা
সাজিয়ে রেখেছে
অস্থিপঞ্জরের প্রদর্শনী।

এ-বৎসরে বৃদ্ধ, যুবা, শিশু ও রমণী
আষাঢ়ে পিঙ্গলবর্ণ ঘাসে
হাত রেখেছিল। তারা কার্তিকের বিষণ্ণ আকাশে
তোলেনি প্রদীপ। অগ্রহায়ণের রাতে
এবারে সমস্ত হাড়ে কাঁপন ধরেছে।

চেনা ও অচেনা লোকও চতুর্দিকে বিস্তর মরেছে
এইবার।
অথচ এইবারই ছিল মাল্যচন্দনের সর্বাধিক
ঘনঘটা। এবং যৎপরোনাস্তি হুলুধ্বনি ছিল
প্রমত্ত হাওয়ায়।

অর্থাৎ অনেকটা গিয়ে তবুও অনেকটা থেকে যায়:
ঘাড়ে লাগে হাওয়ার কামড়,
মৃত্যু এসে ঢুকে পড়ে সমস্ত খেলায়,
তবু খেলাঘর
সাজিয়ে তুলবার ইচ্ছা থাকে।
এক্ষেত্রে কেন যে সেই ইচ্ছাও কণিকামাত্র নেই,
কে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে তাকে,
সন্ধ্যালগ্নে যে ওই দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রবেলায়?

হারায় না

শুকতারাকে সাক্ষী রেখে
রাত্রিগুলি
নিঃশব্দে আমাদের চোখের আড়ালে
চলে যায় বটে,
কিন্তু
তাই বলেই যে হারিয়ে যায়, তা নয়।
ভোল পাল্টে
গায়ের উপরে ঝকমকে একটা পোশাক চাপিয়ে
তারাই আবার
সকাল হয়ে ফিরে আসে।

ফিরে আসাটাই যে নিয়ম,
আমরা তা খুব ভালই জানি।
আর তাই
চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের সেই
ভিখারিনি বালিকা যখন
পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে হঠাৎ
রাজকন্যা হয়ে
স্টেজের উপরে ফিরে আসে,
আমরা তখন একটুও অবাক হইনি।

আমরা জানি,
তিন মিনিটের বিরতিটাকে কাজে লাগিয়ে
গ্রিনরুমে বসে
খুব দ্রুত সে তার পোশাক পালটে নিচ্ছিল।

সত্যি বলতে কী,
বিয়ের আসরে শাঁখ বাজবার মুহূর্তে
রাজকন্যা তাঁর মুক্তোর মালা যখন

ছিঁড়ে ফেললেন,
তখনও একটুও মন-খারাপ হয়নি আমাদের।

কেননা,
তখনও আমরা জানতুম যে,
কিছুই শেষপর্যন্ত হারিয়ে যাবে না।
থিয়েটার-হল্ থেকে বেরিয়ে এসে যদি
উপরে একবার
চোখ তুলে তাকাই,
তাহলে ঠিকই দেখতে পাব
আকাশ জুড়ে সেই মুক্তোগুলিকে আবার
নতুন করে
গেঁথে তুলবার কাজ চলেছে।

মধ্যবর্তী মানুষেরা

কেউ যখন তার উপকারীদের
কপাল টিপ করে
পাথর ছুঁড়তে থাকে,
আমি তখন
একটুও অবাক হই না।
আমি বুঝতে পারি যে, লোকটা আসলে তার
পরাজিত মুহূর্তের সাক্ষীদের
একে-একে
নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।

তখনও আমি অবাক হই না,
যখন দেখি যে, কেউ
বাঁ-হাতে কাউকে কিছু দিয়ে, তারপর
ডান-হাতে টিপে ধরেছে তার
আত্মসম্মানের টুঁটি।
কেননা, তখনও আমি বুঝতে পারি যে,
উপকারী হবার শখ হয়েছে বটে,
কিন্তু তার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি না-থাকলেই নয়,
লোকটার তা নেই।

একদিকে কিছু অকৃতজ্ঞ মানুষ, এবং
অন্যদিকে কিছু আত্মসম্মান-ক্রয়কারী উপকারী মহাজন,
সবকিছু জানি ও বুঝি বলেই
ভয়ংকর এই দুটি দলের ভিতর দিয়ে
খুব সতর্ক পদক্ষেপে আমাকে
এগিয়ে যেতে হয়।

চৈত্রদিন

চতুর্দিকে পড়ে আছে নানা উপকারের অন্তিম
শবদেহ। গির্জা, মঠ, মন্দিরের
ইট, কাঠ। ঘণ্টার তোবড়ানো
পিতল, ক্রিজের খাঁচা, এবং তৎসহ
বিশ্বজয়ী সৈন্যের সম্মানে
যা নির্মিত হয়েছিল, সেই স্মৃতিস্তম্ভও এখন
ধুলো-বালি-জঞ্জালের চূড়ান্ত শয্যায়
শুয়ে আছে।

একটিও মানুষ নেই কাছে।
চৈত্রের হাওয়ায়
ঝরে শুকনো হল্‌দে পাতা, ওড়ে খড়কুটো।
তীব্র নীল
আকাশের হৃৎপ্রদেশে নখর বসিয়ে
ডেকে ওঠে শেষ শঙ্খচিল।
পরক্ষণে
অন্য আকাশের খোঁজে সেও দ্রুত দূরে চলে যায়।

জয়ন্তী পাহাড়ে

পাহাড়ের মাথায় বনবিভাগের বাংলো,
তলায় নদী,
নদীর উপরে ব্রিজ।
ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলুম, নীচে
পাথরের সঙ্গে জলের তুমুল
মারদাঙ্গা চলেছে। কিন্তু
যেহেতু সেদিন অমাবস্যার রাত ছিল, তাই আমরা
জল দেখতে পাইনি।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অবশ্য দেখতে পেয়েছিলুম যে,
হামানদিস্তেয় চূর্ণ করা
ঝকমকে পাঁচ লক্ষ হিরের ধুলো উড়ছে সেখানে।
বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ
নামিয়ে নিতে হয়।

চোখ নামালেই অন্ধকার। আর সেই
অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঝরঝর করে বয়ে যায়
হাওয়া।
পরক্ষণে জলের গর্জন জেগে ওঠে।
কিন্তু জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে শুধু
জলের শব্দই আমরা সেদিন
শুনেছিলুম।
জল দেখতে পাইনি।

সাদা বাড়ি

সবকিছুরই শেষে থাকে
একটা মস্ত
ধবধবে আর খুব প্রশস্ত
সাদা বাড়ি।
কেউ সেখানে জ্যোৎস্না-রাতের গন্ধবহ সাবান মাখে,
কেউ একাগ্র দেউল-চূড়ার ছবি আঁকে,
কেউ সেখানে জলের ঝারি
হাতে নিয়ে গোলাপ-বনে ঘুরে বেড়ায়।

বুকের মধ্যে শব্দগুলি জমতে-জমতে হারিয়ে যায়।
শেষ হয়ে যায় সকল কথা।
বুঝতে পারি, এখন ক্লান্ত
গয়নাগাঁটির ভিতর থেকে খুব প্রশান্ত
অন্যরকম ঘরসংসার মাথা তুলছে।
বুঝতে পারি,
এই মুহূর্তে জানলা এবং দরজা খুলছে
স্তব্ধ বিশাল সাদা বাড়ি।

কবি ও ভাস্কর

"আমি তৈরি করিনি,
এই মূর্তি আসলে
পাথরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।
পাথরের বুকে ছেনি চালিয়ে
তার ভিতর থেকে
লুকনো এই মূর্তিটিকে আমি
বার করে এনেছি মাত্র।"
আমাকে এক ভাস্কর একদা বলেছিলেন।

আমাকে এক কবিও একদা বলেছিলেন,
"এ তো আমার হাতে তৈরি নয়,
শব্দের এক বিশাল অরণ্যের মধ্যে
লুকিয়ে ছিল এই কবিতা।
আগাছা আর লতাগুল্মের জঞ্জাল সরিয়ে
অরণ্যের বুকের ভিতর থেকে
লুকনো এই কবিতাটিকে আমি
বার করে এনেছি।"

ভিটেবাড়ি

যার বাড়ি, তার দেখা
নেই, সে চলে গেছে
দূরের পথে একা
হালের বলদ বেচে,
সাঙ্গ খেলা তার।

এই রকমই যাওয়া
সংকটে, সন্তাপে।
এখন শুকনো হাওয়ায়
জ্যৈষ্ঠ মাসে কাঁপে
রোদ্দুরে চারধার।

শুকিয়ে ওঠে মাঠ,
পানায়-ভর্তি পুকুর,
ঘুণ-ধরা চৌকাঠ,
ঝিমোয় নেড়ি কুকুর,
শুকোয় ছেঁড়া শাড়ি।

শূন্য খাঁখাঁ দাওয়ায়
ঘুরছে শালিখ দুটো,
দুপুরবেলার হাওয়া
ওড়াচ্ছে খড়কুটো।
ন্যাখ্‌সে ভিটেবাড়ি

চোখের মলম

সবেফুলের মাঠ যেখানে ঢালু হয়ে
নদীর বুকে নেমেছে,
দুপুরের রোদ্দুরে সেখানে বালি চিকচিক করে।
নদীর পাড়ে
বুড়ো একটা বটগাছ।
ময়াল-সাপের মতন মোটা-মোটা তার শিকড়ে বসে
রাখাল-ছেলেরা হাওয়া খায়।

বটগাছটার পাশেই একটা মানুষে-টানা
কাঠ-চেরাইয়ের কল।
উপরে-নীচে দাঁড়িয়ে দু'জন মানুষ
করাত টানে, আর
মাটির উপরে জমতে থাকে
কাঠের গুঁড়ো।

নৌকোগুলো ভাটার টানে একটু-একটু করে এগোয়।
মাঝিরা চুপচাপ হাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।
দেখে বোঝা যায়,
কোথাও গিয়ে পৌঁছবার কোনো তাড়া তাদের নেই।

পিছন ফিরে তাকালেই এই ছবিটা আমার
চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
মনে হয়,
চোখের অসুখের পক্ষে এর চেয়ে
ভাল কোনো মলম
এখনও কেউ তৈরি করতে পারেনি।

ভালবাসার জন্য

এই পৃথিবীর মধ্যে ছিল
হাজার-হাজার মানুষ, বাড়ি,
ফুলবাবু আর দিনভিখারি,
অরণ্য, পথ, নদী, পাহাড়,
রৌদ্র, জ্যোৎস্না, কুয়াশা আর
আকাশ জুড়ে অজস্র রং।
খানিকটা তার গন্ধে এবং
খানিকটা তার পদ্যে ছিল।

এই পৃথিবীর মধ্যে ছিল
অনন্ত এক শীতলপাটি।
অনেক দাঙ্গা ঝগড়াঝাঁটি
পার হয়ে তাই ভালবাসা
জাগিয়েছিল অনেক আশা,
ফুটিয়েছিল অজস্র রং।
খানিকটা তার গন্ধে এবং
খানিকটা তার পদ্যে ছিল।

ভাদ্ররজনীর মধ্যযামে

ভাদ্ররজনীর মধ্যযামে যারা কখনও
বিনিদ্র থাকেনি,
তারা জানে না যে, অন্ধকার
কত জমাট ও
স্তব্ধতা কত নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠতে পারে।

সারাদিন বৃষ্টি হয়নি।
রাত্রির আকাশেও হিরের কুচির মতো
ছড়িয়ে ছিল
হাজার-হাজার নক্ষত্র।

আমি দেখছিলাম যে, আকাশ জুড়ে
নক্ষত্রচূর্ণের
নিঃশব্দ ঝড় বইছে। আর সেই
আকাশের তলায়
অন্ধকারের মধ্যে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে এই
শহরতলির শেষ মহীরুহ।

বাতাস বইছিল না।
আমার মনে হচ্ছিল,
পৃথিবী নামক এই বিশাল বাড়ির কোনো দরজার
অন্তরালে সে এখন
চুপচাপ প্রহর গুনে যাচ্ছে।

হলদিয়ায়

মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে যখন আমরা
হলদিয়ায় পৌঁছই,
নদী আর আকাশকে তখন
আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না।
মনে হচ্ছিল,
হয় আকাশটা নদীর মধ্যে হারিয়ে গেছে,
নয়তো আকাশের মধ্যে নদী।

পরদিন সকালে
চারদিক আলো করে সূর্য উঠল।

তখন দেখলুম,
এত বৃষ্টিতেও নদীর রঙ একটুও পাল্টায়নি। কিন্তু
আকাশের রঙ টলটলে নীল।
ঘোলা জলের ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই যেন
আকাশটা হঠাৎ
অনেক উঁচুতে উঠে গেছে।

ফিরে আসা

চোরাবালিতে
লোকটা যখন আকণ্ঠ ডুবে গেছে,
ঠিক তখনই সে তার
পায়ের তলায় পেয়ে গেল
শক্ত মাটি।

কাঠুরিয়ার ঘাড়ের উপরে থাবা বসিয়ে
বাঘ কি কখনও ফিরে যায়?
যাকে সে নিশ্চিত বলে জেনেছিল,
সেই মৃত্যুকে পায়ে-পায়ে ফিরে যেতে দেখেও
লোকটা তাই বিশ্বাস করতে পারছে না সে
বেঁচে আছে।

হাওয়ায় কাঁপছে সুপুরি আর নারকেলের পাতা
আকাশের বুকের মধ্যে নখ বিঁধিয়ে দিয়ে
বেঁচে থাকার উল্লাসে
ডেকে উঠছে শঙ্খচিল।

বড় মধুর এই হাওয়া।
বড় সুন্দর ওই ডাক।
আস্তে-আস্তে লোকটা এখন আবার তার
পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর মধ্যে, তার
বিশ্বাসের ভূমির উপরে
ফিরে আসছে।

শরিক

দু'দিন আগেও পরস্পরকে যারা
আঁকড়ে ধরে ছিল,
তারাই এখন যে যার ঘরে খিল এঁটে খুব
আঙুল মটকাচ্ছে।

বাড়ির মধ্যে হেঁশেল বলতে অবশ্য একটাই।
সেই হেঁশেলের
চার দিকে চার বউয়ের এখন
চার-চারটে উনুন।

উনুনের উপরে কড়াই,
কড়াইয়ের মধ্যে বুড়বুড়ি কেটে গরম হচ্ছে
ঝাঁঝালো সর্ষের তেল।
তাতে যা-ই পড়ুক,
ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হয়।

শাশুড়ি-বুড়ির বুকের মধ্যেও ছ্যাঁক করে একটা
শব্দ হয়।
কিন্তু চুপচাপ সে তার মালা ঘুরিয়ে যায়,
কিছু বলে না।

জ্যোৎস্নারাতে

করেছি ভুল কিছু বটে,
রটেছে তার চেয়ে বেশি।
রটুক ; আমি ভিনদেশী
দেখি যে, আকাশের পটে
জ্যোৎস্নাধারা এলোকেশী।

আলোয় ভাসে কানাগলি,
কোথাও নেই কোনো কথা।
অথচ এই নীরবতা,
একেও ভুল করে বলি :
স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

রোহিণীকুমার

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা দিয়ে
উত্তর-শহরতলির এই
কলোনির মধ্যে খুবই কষ্টেসৃষ্টে যিনি
দশ বাই দশ দুখানা শোবার ঘর,
পাঁচ বাই সাত একখানা রান্নাঘর,
ওই মাপের একটি দর্মা-ঘেরা কলঘর, এবং একফালি
তিন বাই আট বারান্দার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন,
সেই রোহিণীকুমার চৌধুরী এতদিন
উর্ধ্বমুখী হয়ে
আকাশ দেখবার অবকাশ বড় একটা পাননি।

ছেলেবেলায় এক-আধবার দেখেছিলেন হয়তো,
কিন্তু সে খুব দূরের ব্যাপার,
বলতে গেলে প্রায় গতজন্মের ঘটনা।
ম্যাট্রিক পাশ করে
কুষ্টিয়া থেকে কলকাতায় এসে
বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটের এই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে
ভর্তি হওয়া ইস্তক
স্রেফ লেজার-বইয়ের মধ্যেই তাঁর চোখ বরাবর
আটকে ছিল।

সেই রোহিণীকুমার এখন মুক্ত পুরুষ।
রিটায়ার করে, বাড়ি তুলে,
উত্তর-শহরতলির এই নেতাজি-নগরে যেদিন তিনি
গৃহপ্রবেশ করেন,
সেদিন থেকে তাঁর চোখ দুটিরও
মুক্তি ঘটে যায়।

অতঃপর তিনি
ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশ দেখতে শুরু করেন।
তার ফলাফল যে যারপরনাই ভাল হয়েছে,
এমন কথা অবশ্য বলা শক্ত।
জায়গাটা প্রায় মফস্বলের মতো;
সেই কারণে
রাত্তিরবেলা উপরের দিকে চোখ তুললেই এখানে
ঝকঝকে নক্ষত্রে ভরা মস্ত একটা আকাশ দেখা যায়।
শোনা যাচ্ছে,
রোহিণীকুমার আজকাল নাকি
অনেক রাত পর্যন্ত সেই নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে
তাকিয়ে থাকেন।

এই যে ঘটনা, এর অনেকরকম ব্যাখ্যা সম্ভব।
কিন্তু সে-সব ব্যাখ্যায় আমি
কান দেব কেন ?
আমি তো একজন 'খবুরে কাগুজে' পদ্যকার,
উপরন্তু আমি নিজেও অনেককাল যাবৎ এই
একই কলোনির বাসিন্দা,
সুতরাং খুবই বিশ্বস্তসূত্রে আমি এই খবর পেয়ে গেছি যে,
আকাশের ওই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যেই
রোহিণীকুমার তাঁর
অনেককাল-আগে-নিরুদ্দিষ্ট-হয়ে-যাওয়া মা'কে এখন
খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

জলের বদলে

"জলের মাত্রা কমিয়ে দিন,
তা নইলে আপনার এই গোলাপচারা শুধু
পাতা-ই ছাড়বে,
কস্মিনকালেও ফুল দেবে না।"
নার্সারির ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন,
"তেষ্টায় ছটফট না-করলে
মানুষই কখনও ফুল দেয় না, তা
গাছের আর দোষ কী!"

তেষ্টায় ছটফট করতে-করতে আমি আজ
দেখতে পাই,
পুষ্পবিলাসীরা তাদের জলের ঝারি থেকে
জলের বদলে
কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল।
দেখি আর ভাবি যে,
কেউ একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই এখন আমি
আগুন হয়ে ফুটে উঠতে পারব।

আশ্বিনের খবর

হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা-টানে
জল থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে
মাছটা যখন
ডাঙার উপরে এসে আছড়ে পড়ে,
তখনও তার
মুখের মধ্যে বঁড়শি গাঁথা।

মাছটা যখন
ডাঙার উপরে ধড়ফড় করতে-করতে একসময়
শান্ত হয়ে যায়,
আশ্বিনের আকাশ তখন নীল, আর
বাতাসে তখন ভেসে বেড়াচ্ছে
সাদা রঙের মেঘ।

সাদা পাঞ্জাবির বুক-পকেটে ফুটে উঠেছে
রক্ত-রঙের রুমাল,
বাসের ফুটবোর্ড থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে
চৌরঙ্গি রোডের উপরে
ধড়ফড় করতে-করতে লোকটাও হঠাৎ একসময় খুব
শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

পরক্ষণেই চোখ তুলে আমি দেখেছিলাম যে,
আকাশ সেদিনও সেই
একই রকমের নীল, আর
সাদা রঙের মেঘ সেদিনও আকাশ জুড়ে
আশ্বিনের খবর রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

রৌদ্রে বাজে বীণা

আজ সকালে চতুর্দিক ভাসিয়ে রোদ্দুর
উঠেছে, আকাশটা আজকে ফিরে গেছে নিজের জায়গায়।
কিছু-কিছু প্রত্যাশার স্বর
কক্ষনো বাজে না কানে, কিন্তু তারা দোলা দিয়ে যায়
রৌদ্রে-ভরা এইসব সকালে প্রাণে এসে।
যেমন আজকেই দিচ্ছে। নিতান্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ পোকা ও মাকড়,
ঘাসের ভিতরে যারা সংসার সাজায়, বাঁধে ঘর,
নিরঙ্কুশ তাদেরও প্রত্যেককে ভালবেসে
আকাশ বাজায় তার বীণা
এইরকম দৈব দিনে কখনও-কখনও।

আমি শুনি, তুমিও তা শোনো
প্রাণের ভিতরে।
অথচ কেন যে বীণা বেজে যায়, কিছুই বুঝি না।
না আমি, না তুমি। আমরা দীর্ঘদিন জ্বরে
ভুগে-ভুগে একদিন হঠাৎ
জেগে উঠে দেখতে পাই, যন্ত্রণার রাত
কেটে গেছে, শরীরটা ঝরঝরে লাগছে; রোদ্দুরে হাওয়ায়
এবং আকাশে
অনন্ত প্রত্যাশার ছবি ভাসে।
বীণা বাজে, সমস্ত জীবন জুড়ে বীণা বেজে যায়।

অগ্নিবলয়

দরজা বন্ধ হবার পরেও কিছু লোক
অভ্যাসবশত থেকে যায়
বাইরে রৌদ্রে পথেঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।
তাদের মূর্খতা অবিমৃশ্যকারিতার কথা নিয়ে
গল্পগাথা বানাবার ঝোঁক
ইদানীং বৃদ্ধি পাচ্ছে গ্রামে ও শহরে।

বলাই বাহুল্য, যারা এইসব গল্পগাথা অক্লেশে বানায়,
দ্বিপ্রহরে তারা পথে-প্রান্তরে ঘোরেনি,
অগ্নিবলয়ের মধ্যে তারা কেউ কক্ষনো পোড়েনি,
তারা প্রত্যেকেই ছিল ঘরে।

ভাসানের রাত

কিছু ছিল রাতের আকাশে,
কিছু ছিল ঝড়ের হাওয়ায়,
কিছু ভোরবেলাকার ঘাসে,
কিছু তার চোখের চাওয়ায়।

আলোতে যেমন ছিল কিছু,
তেমনি আঁধারে অভিমানে
দেবীপ্রতিমার পিছু-পিছু
কিছু চলে গিয়েছে ভাসানে।

আজ রাতে ঘুম নেই চোখে,
কথা নেই রাতের হাওয়ায়।
ভাবি কেন আঁধারে-আলোকে
তারা আসে, কেন চলে যায়।

খেলাচ্ছলে

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছি, কিন্তু সে তো খেলাচ্ছলে। কারও রক্ত ঝরাবার
ইচ্ছা কি আমার ছিল? কক্ষনো ছিল না।
তবু সেই মুহূর্তে আঁধার
ছিঁড়ে গিয়েছিল আর্তনাদে ও বিলাপে।
পরক্ষণে গিয়েছিল শোনা
অভিশাপ : হে ঈশ্বর, অন্যকে যে খেলাচ্ছলে মেরেছে, তুমিও
মারো, তাকে মারো।

এখন পায়ের নিচে খুঁজে পাই না তিলার্ধ ভূমিও।
চতুর্দিকে বাতাসের খেলা
যত জমে ওঠে, তত অন্ধকার কাঁপে
ভাবি যে, এইবারে এসে গায়ে লাগবে ঈশ্বরের ঢেলা।

আগাছার দিন

"গাছপালা রয়েছে, আছে লোমশ জন্তু ও শিশুরাও।
তবে আর ভাবনা কী হে, যাও,
বাইরে গিয়ে ছাখো, আজও বৃষ্টি পড়ে, আজও
আঁধার ছাপিয়ে সূর্য দেখা দেয়। বাঁচো তবে, বাঁচো।
দেখবে যে, কঠিন নয় বাঁচা।"

এই কথা বলতেন যিনি, তিনি নেই। তাঁর
বন্ধুরা আছেন, আর বন্ধুদের নিষ্পাদপ উদ্যানে আগাছা
বেঁচেবর্তে আছে।
বৃষ্টি না পড়ুক, সূর্য না উঠুক, তবুও বাঁচবার
অর্থ না-খুঁজেই তারা চমৎকার বাঁচে।

অঘ্রানের দুপুর,
উত্তরের হাওয়ায় কাঁপছে
শালগাছের পাতা।
পুকুরের জলে কাঁপছে
রোদ্দুর।

পুকুরের পিছনে
কালো-কুচকুচে ফিতের মতো
রাস্তা।
রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে
বেলপাহাড়ির দিকে।

ছুটি ফুরিয়েছে,
আজই আমি কলকাতায় ফিরব।

ফেরার আগে,
চাষি যেভাবে হাইওয়ে থেকে তার
ধান খুঁটে নেয়, ঠিক সেইভাবে আমার
ঝুলির মধ্যে কুড়িয়ে তুলছি
দহিজুড়ির ছবি।

হরদুলালের জীবন-মৃত্যু

হরদুলাল যে খুব অসুস্থ,
এই খবর পেয়ে
পথের থেকে আমাদের এক ডাক্তার-বন্ধুকে জুটিয়ে নিয়ে
আমি যখন তার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছই,
হরদুলাল তখন মারা যাচ্ছে ।

হরদুলাল আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু ।
ইস্কুল ফাঁকি দিয়ে
ময়দানে আমরা ব্ল্যাকওয়াচ রেজিমেণ্টের সঙ্গে
মোহনবাগানের খেলা দেখেছি ;
কলেজ ফাঁকি দিয়ে
টকি শো হাউসের ম্যাটিনি-শোয়ে দেখেছি
গ্রেটা গার্বোর ছবি ।

হরদুলালের চেহারা তখন খুব সুন্দর ছিল ।
সেইসঙ্গে তার মুখে ছিল
এমন নিষ্পাপ সারল্য,
পাঁচ পেরোবার পরেই মানুষের মুখ থেকে যা হারিয়ে যায় ।

যে-লোকটি তার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে,
আমার সেই ছেলেবেলাকার বন্ধুর সঙ্গে অবশ্য তার
কোথাও কোনো মিল নেই ।
তার কপালে ভাঁজ,
তার গাল তোবড়ানো, তার ঠোঁটের কোণে ফেনা জমেছে,
তার চোখ দুটো ঘোলাটে ।

আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের ভিড়ের মধ্যে
বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে

ঘাড় কামড়ে ধরে
মৃত্যু একটা লোককে তার
অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে
হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে,
এই দৃশ্য এত নিরুপায়ভাবে দেখতে চাই না বলেই
হরদুলালের সেই ঘোলাটে চোখ দুটি যখন
স্থির হয়ে যায়,
তার একটু আগে আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম।

ফলে, হরদুলাল মারা যাবার পর মিনিট কয়েকের মধ্যেই
তার শরীরে যে-সব
ওলটপালট ব্যাপার ঘটে যায়,
আমি তা দেখিনি।
সেই কারণেই ঘরে ঢুকে আমি অবাক হয়ে যাই।

নিষ্পলক আমি দেখতে থাকি যে,
তার কপালে এখন আর একটাও ভাঁজ নেই,
তার ঠোঁটে ফুটেছে কৌতুকের হাসি, আর
চোখে ফুটেছে সেই সারল্য,
ইস্কুল-কলেজের দিনগুলিতে
হরদুলালের চোখে যা আমরা সর্বদাই দেখতে পেতুম।

ইস্কুলের দিনগুলির কথা আমার
মনে পড়ে।
জমিদারবাড়ির ছেলে তো, তাই টিফিনের সময়
আমাদের মতো সে কক্ষনো
জিবেগজা কি ঝালমুড়ি কি ঘুগনি কিনে খেত না।
বাড়ি থেকে, রোজ একজন চাকর তার জন্যে
দুধ আর সন্দেশ নিয়ে আসত।
তাই নিয়ে তাকে খুব খেপাতুম আমরা। এমন কী,

শেষের দিকে
বাংলার স্যারও তাকে
হরদুলাল না-বলে নন্দদুলাল বলে
ডাকতে শুরু করেছিলেন।

কলেজের দিনগুলির কথাও মনে পড়ে যায়।
ওরই পয়সায়
সিনেমা দেখতুম আমরা সবাই,
ওরই পয়সায়
শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড়ে
কষা-মাংস খেতুম।
খেতে-খেতেই ওকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি।
কিন্তু আমরা যে যতই খোঁটা দিয়ে কথা বলি না কেন,
হরদুলাল তার উত্তরে কিছু বলত না।
শুধু হাসত।

চট করে আমার চোখ চলে যায়
ঘরের দেওয়ালে।
হ্যাঁ, হরদুলালের একটা ছবি সেখানে টাঙানো রয়েছে বটে,
কিন্তু সেটা তার তরুণ-বয়সের আলেখ্য নয়,
হালের ছবি।
মিনিট দশ-পনেরো আগে দেখলেও
যে-ছবির সঙ্গে
অকালে-বুড়িয়ে-যাওয়া অমিতাচারী এই মানুষটিকে ঠিকই
মিলিয়ে নেওয়া যেত।

এখন আর যাচ্ছে না।
আর সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছে যে, ডোরিয়ান গ্রের
গল্পটা নেহাত রূপক মাত্র,
সত্যি নয়। আমার এমনও মনে হচ্ছে যে,

যাকে আমরা শারীরিক যন্ত্রণা বলে জানি,
সেই যন্ত্রণা, এমন-কী, আমাদের শরীরটাকেও
দখল করতে পারে না।

হরতুলালের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে আছি।
আমি দেখছি যে,
যত যন্ত্রণাই সে ভোগ করে থাকুক,
সেই যন্ত্রণা তার শরীরে কোনো ছাপ রাখতে পারেনি
মৃত্যু এসে তার যন্ত্রণাকে হটিয়ে দেবার
সঙ্গে-সঙ্গেই তাই
ভাঁজ পড়া কপাল আর ঘোলাটে চোখের
সমস্ত ছলনার ভিতর থেকে
হরতুলালের শরীরটা আবার সেই আগের মতোই
হেসে উঠেছে।

দরজা খোলো

সারাটা দিন আমাকে তুমি
দরজার বাইরে
দাঁড় করিয়ে রেখেছ।

রাস্তা থেকে সারাটা দিন আমি
নুড়ি কুড়িয়েছি।
আমার মুখে লেগেছে ধুলোর ঝাপ্‌টা, আমার
শরীর পুড়েছে রোদ্দুরে।

সারাটা দিন আমি আপন মনে
খেলা করেছি।
সারাটা দিন আমি আপন মনে
গান গেয়েছি।

কেউ আমাকে পাগল ভেবেছে,
কেউ ভেবেছে ভিখিরি।
তারা কেউই আমাকে চেনে না।

শুধু তুমিই আমাকে চেনো। তুমি
দরজা খুলে দাও।